রোকেয়া দিবস '৯৭

৯ ডিসেম্বর

"কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দাও। নিজের অন্ন বস্ত্র উপার্জন করুক"

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

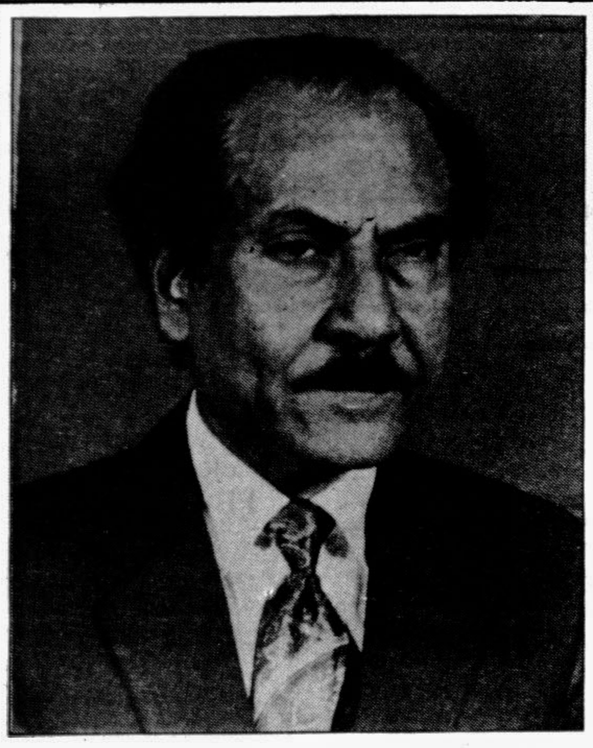

বাণী

'বেগম রোকেয়া দিবস'-এ আমি নারী মুক্তি, নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

সামাজিক প্রতিকূলতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ নারী সমাজ বিশেষ করে মুসলিম নারী সমাজকে শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার অবদান অবিস্মরণীয়। নারী সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করে নারী-পুরুষের সমতা আনয়ন জাতীয় অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। এ জন্য নারী শিক্ষার প্রসারসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী সমাজের উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বেগম রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশের নারী সমাজ শিক্ষা-সচেতন হোক এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সফল হোক, এটাই আমার ঐকান্তিক কামনা।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বেগম রোকেয়া স্মরণে

মেহের কবীর

কোনো সমাজেই বেগম রোকেয়ার মতো মানুষ বেশি জন্মগ্রহণ করেন না। রোকেয়া ছিলেন তাঁর সময়ের চাইতে অনেক বেশি অগ্রসর। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে তিনি নারী সমাজের সার্বিক স্বাধীনতার কথা ভেবেছেন, তা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছেন। তখনও প্রাচ্যে নারীমুক্তি বা নারীবাদ কথাগুলির প্রচলন হয়নি। মেয়েদের শিক্ষিত করতে না পারলে তাদের মুক্তি আসবে না, বেগম রোকেয়া এটা প্রথম থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। মনের মুক্তি হওয়া জরুরী। অজ্ঞানতার জন্যই নানা রকম কুসংস্কার মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। এখন ধর্মের নামে শোষণ ও নির্যাতন চলে বিভিন্নভাবে।

কী রকম সমাজে রোকেয়া বেড়ে উঠেছিলেন তা তাঁর কথাতেই শুনন ঃ **"সবে মাত্র পাঁচ বৎসর হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। হাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই, অথচ পর্দা করিতে হইত"।**

বাড়িতে শুধু আরবী ভাষার চর্চা ছিল, তাও সীমিত কেবলমাত্র কোরান পাঠে। নিজে বড়ো ভাই-এর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রোকেয়া লিখেছেন, **"চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে টিয়া পাখীর মত কোরান শরীফ ব্যতীত আর কিছুই পড়িতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইত না"।**

ওই পরিবেশ থেকে রোকেয়া অনেক উর্দুতে উঠে এসেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি নারীশিক্ষা বিস্তারের অঙ্গনে। স্বচ্ছ চিন্তা, অসাধারণ মনের জোর ও কঠিন পরিশ্রম করে রোকেয়া গড়ে তোলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল।

ষোল বছরে বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। উদার মনের অধিকারী ও সাহিত্যানুরাগী স্বামীর উৎসাহে রোকেয়া লেখার জগতে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯০৫ সালের দিকে তিনি রচনা করেন Sultana's Dream নামক অসামান্য পুস্তিকাটি। নারীমুক্তির বিষয়টি এ রকম তীব্র শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসমন্ডিত হয়ে খুব কমই রচিত হয়েছে। সাখাওয়াত হোসেন রচনাটি পড়ে মন্তব্য করেছিলেন ঃ "A terrible revenge"।

১৯০৯ সালে স্বামী সাখাওয়াত বহুমূত্র ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করার পর স্বামীর প্রদত্ত অর্থে রোকেয়া ওই বছরেই ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। পরে তা কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এরপর প্রায় দুই যুগ ধরে বেগম রোকেয়া দিনরাত প্রচন্ড পরিশ্রম করে বিদ্যালয়টিকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করান। অসম্ভব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে, কিন্তু তিনি হতোদ্যম হননি। কখনো হাল ছেড়ে দেননি। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে রোকেয়ার মনে কোন অস্পষ্টতা ছিলা না। 'সুবেহ সাদিক' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

"আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে (নারীদের) নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে ... শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই, তাহাদের জীবন শুধু পতিদেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়"।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটিকে টিকিয়ে রাখা ও উন্নত করার জন্য রোকেয়া ১৯০৯ সাল থেকে ১৯৩২- এ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করেন। বহু বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয় তাঁকে। তবে কয়েকজন উদারপন্থী শিক্ষানুরাগী সমাজদরদী মানুষের কাছ থেকে তিনি উৎসাহও পেয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে সরোজিনী নাইডু হায়দ্রাবাদ থেকে রোকেয়াকে লেখেন ঃ

"Will you allow a stranger like me to write and tell you from my sick bed how greatly I have sympathised with your brave work for several years and how deeply I have admired your sacrifice and devotion in not only founding but so ably sustaining your work of education for Muslim girls.

Need I say how proud I am when any sister of mine, Hindu or Muslim, comes forward to do such patriotic work ?"

বাংলার মুসলমান সমাজকে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে, কী কী জিনিস শৃঙ্খলিত করে রাখে সে সম্পর্কে রোকেয়ার স্পষ্ট ধারনা ছিল। তিনি দেখেছিলেন যে প্রায় সব সময় ধর্মের কথা বলে মেয়েদের ক্ষুদ্র ও বঞ্চিত করে রাখা হয়। পুরুষশাসিত সমাজে ধর্মগুরু থেকে সমাজপতি পর্যন্ত সবাই বিধান দেন ঃ "রমণী সর্বদাই নরের অধীনা থাকিবে, বিবাহের পূর্বে পিতা কিংবা ভ্রাতার অধীনা, বিবাহের পর স্বামীর অধীনা, স্বামী অভাবে পুত্রের অধীনা থাকিবে।"রোকেয়া তীব্র ভাষায় বলেছেন, "আর মূর্খ নারী নত মস্তকে ঐ বিধান মানিয়া লইল"। " তিনি মেয়েদের বিদ্রোহের বাণী শোনালেন ঃ "..... এখন আমরা আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের প্রভুত্ব সহিব না।" একথা বলার পর সমাজ সম্পর্কিত কথা বলতে গিয়ে কেন তিনি ধর্মের প্রসঙ্গ তুলেছেন তার ব্যাখ্যা নিজেই দিয়েছেন, "ধর্মই আমাদের দাসত্ব বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে। ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।" তাই "ধর্ম লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্মিকগণ আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন।" রোকেয়া তাঁর লেখায় এটা স্পষ্ট করেছেন যে তাঁর এসব উচ্চরণের ধর্মে অর্থে তিনি ধর্মের সামাজিক বিধানসমূহকে বুঝিয়েছেন।

কতো আগে রোকেয়া লিখেছেন ঃ

"আর এই যে আমাদের অতি প্রিয় অলঙ্কারগুলি- এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ।.... কারাগারে বন্দীগণ পায়ে লৌহ নির্মিত বেড়ী পরে, আমরা আদরের জিনিস বলিয়া স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ 'মল' পরি। ... কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dog-collor) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে। ... গোস্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাক দড়ি" পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে নোলক পরাইয়াছেন। ঐ নোলক হইতেছে স্বামীর অস্তিত্বের নিদর্শন। অতএব দেখিলেন ভগিনী ! আপনাদের এ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? আবার মজা দেখুন, যাহার শরীর দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক তিনি সমাজে ততোধিক মান্যাগণ্যা !"

এরপর রোকেয়া অসামান্য কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন যে অলঙ্কার সম্পর্কে এসব কথা বলার জন্য কোন কোন বোন হয়ত তাঁকে পুরুষ পক্ষের গুপ্তচর ভাবতে পারে। তারা মনে করতে পারে যে পুরুষদের টাকা বাঁচাবার জন্যই তিনি নারীদের অলঙ্কার বীতশ্রদ্ধ করে তুলছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। মেয়েদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, "যদি অলঙ্কারের উদ্দেশ্য পুরুষদের টাকার শ্রাদ্ধ করাই হয় তবে টাকার শ্রাদ্ধ করিবার অনেক উপায় আছে। দুই একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। আপনার ঐ জড়োয়া চিকটা বাড়ীর আদুরে কুকুরটির কণ্ঠে পরাইবেন। আপনি যখন শকটারোহনে বেড়াইতে যান তখন সেই শকটবাহী অশ্বের গলে আপনার বহুমূল্য হার পরাইতে পারেন। বালা ও চুড়িগুলি বসিবার ঘরের পর্দার কড়ারূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবেই স্বামী নামধারী নরবরের টাকার বেশ শ্রাদ্ধ হইবে। অলঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য দেখান বইত না। এরূপে ঐশ্বর্য দেখাইবেন। নিজের শরীরে দাসত্বের নিদর্শন ধারণা করিবেন কেন ?"

রোকেয়া যখন নারীর দাসত্ব বন্ধন মুক্তির কথা ভেবেছেন তখন আসলে তিনি মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের কথাই ভেবেছেন। মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং নারীর ন্যায্য সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই তিনি ১৯১৬ সালে আঞ্জুমান খাওয়াতীনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। কিন্তু তিনি শুধু সমাজ সংস্কারক বা শিক্ষাব্রতী ছিলেন না, শক্তিধর এক লেখকও ছিলেন। রোকেয়া রচিত 'মতিচুর' 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী', প্রভৃতি তাঁর সাহিত্য কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে তাঁর সাহিত্য চর্চার মূল লক্ষ্য ছিল সমাজে জাগরণ আনা। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে সেকথা নির্ভুলভাবে ফুটে উঠেছে।

তাঁর স্কুলই ছিল রোকেয়ার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ধৃত। ওই স্কুল সম্পর্কে মানুষের উদাসীনতা তাঁকে অনেক সময় ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত করেছে। জীবনের শেষ দিকে স্কুলের এক সভায়, প্রদত্ত ভাষণে আমরা তাঁর ওই ক্ষোভের প্রকাশ মৃদুস্বরে হলেও, লক্ষ্য করি। রোকেয়া বলেছিলেন ঃ

"আমি সর্বদা আপনাদের এই স্কুল নিয়ে বিরক্ত করে থাকি। এমন কি অনেক আমাকে এজন্য এটা nuisance বিশেষ মনে করেন। আমি যদি পৌত্তলিক হতুম, আমার কোন দেবতা থাকতেন তবে তিনিও নিশ্চিয়ই বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'প্রার্থনার সময় ধনং দেহি, মানং দেহি, এসব কিছু না বলে এ মেয়েটা কেবল এক ঘেয়ে 'স্কুলের জন্য গৃহং দেহি, স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি দেহি', বলে ! দাও বেটিকে লাথি মেরে তাড়িয়ে।"

জীবনের শেষ দিকে সমাজের নিরন্তর কটূক্তি ও মিথ্যা কুৎসা, স্কুলের নানা সমস্যা, ব্যক্তিগত শোক ও অসুস্থতার কারণে রোকেয়া বেদনার্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর সেই বেদনা ও হতাশার প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। ১৯৩১ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখের একটি চিঠিতে রোকেয়া লিখেছেন,

"..... কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য মানুষ, তার আবার আশা-ভরসা ! সুতরাং যে কয়দিন বেঁচে আছি খাই দাই, আরাম করি, হাসি খেলি, ব্যস....।

....শৈশবে বাপের আদর পাইনি, বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ urine পরীক্ষা করেছি। পথ্য বেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দুবার মা হয়েছিলুম, তাদেরও প্রাণভরে কোলে নিতে পারিনি। একজন ৫ মাস বয়সে, অপরটি ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর এই ২২ বৎসর যাবৎ বৈধব্যের আগুণে পুড়েছি .... আমি আমার ব্যর্থ জীবন নিয়ে হেসে খেলে দিন গুনছি।"

কিন্তু কাল সাক্ষ্য দেয় যে তাঁর জীনব ব্যর্থতা নয়, বিপুল সার্থকতায় মন্ডিত হয়েছে। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর স্কুল পরিচালনার কাজে সক্রিয় ছিলেন। আজ যে দিকে দিকে নারী মুক্তির হাওয়া বইছে রোকেয়া ছিলেন তার দুঃসাহসী অগ্রদূত। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

বেগম রোকেয়া জন্মেছিলেন ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর আর মৃত্যু বরণ করেন ওই একই দিনে ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩২ সালে। তাঁকে আজ, ৯ই ডিসেম্বর তারিখে, সমগ্র জাতি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। তবে আমাদের সকলের উচিত শুধু বছরের একটি দিনে নয়, সম্বৎসর তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে দেশকে সর্বপ্রকার অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও পরমুখাপেক্ষিতার অভিশাপমুক্ত করার সংগ্রাম সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা।

বাণী

"বেগম রোকেয়া দিবস- ১৯৯৭" পালন উপলক্ষে আমি বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলন, নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণের পথিকৃৎ মহীয়সী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

বেগম রোকেয়া তাঁর জীবদ্দশায় তৎকালীন বাঙালি সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার জিঞ্জির ভেঙ্গে এদেশের চিরবঞ্চিত ও অবহেলিত নারীসমাজকে প্রগতি ও আধুনিকতার পথে এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁর সংগ্রামমুখর কর্মজীবন অনুন্নত দেশের নারীসমাজের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ। নারীরা শিক্ষিত হলে পরিবার ও জাতি শিক্ষিত হয়, সুশিক্ষিত নারী পরনির্ভরশীলতা ও নির্যাতনের কবল থেকে মুক্ত থাকতে পারে -এ সত্য বেগম রোকেয়া মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। আজ আমাদের দেশের অনেক নারী দেশে-বিদেশে আপন মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন, তার ভিত্তিমূলে রয়েছে মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার বলিষ্ঠ ভূমিকা।

বেগম রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাদের বিশেষ অবদান রয়েছে, তাঁদের কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে সরকার প্রতিবছর "বেগম রোকেয়া পদক" নামে একটি জাতীয় পদক প্রদান করছে। নতুন প্রত্যয় নিয়ে দেশের নারী-পুরুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হবেন, বেগম রোকেয়া দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

আমি ০৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭ বেগম রোকেয়া দিবসে নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী বেগম রোকেয়ার আত্মার শান্তি এবং এ দেশের নারী সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধান মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

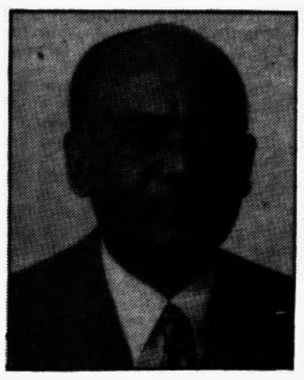

বাণী

নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি নারীমুক্তি আন্দোলনে মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার অবদানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও ৯ই ডিসেম্বর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "বেগম রোকেয়া দিবস" উদ্‌যাপিত হচ্ছে বলে আমি আনন্দিত।

এক তমসাচ্ছন্ন যুগে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতার প্রেক্ষাপটে এক অসাধারণ প্রতিভাময়ী নারী বেগম রোকেয়ার আবির্ভাব। নারী শিক্ষাকে নারী মুক্তির মহান ব্রত হিসাবে উপলব্ধি করে বেগম রোকেয়া যে অবদান রেখে গেছেন তার রেশ ধরে আজ আমাদের নারী সমাজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়ব্রতী হয়েছে।

নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে মুক্তি লাভ করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাঝেই বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন নিহিত রয়েছে।

বেগম রোকেয়া দিবস '৯৭ উদ্‌যাপন আমাদের নারী মুক্তির জন্য অনুপ্রেরণা বয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস।

আবদুল্লাহ হারুন পাশা
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

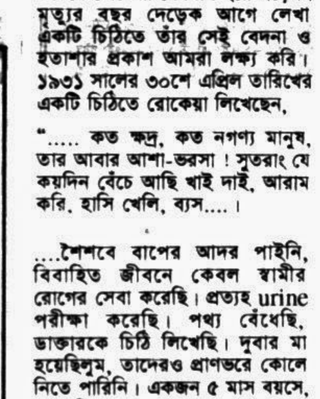

বাণী

একটি উন্নত জাতি ও আদর্শ সমাজ গঠনে নারী শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই ধ্রুব সত্যকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে যে মহীয়সী মহিলা আমাদের নারী সমাজে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো বিরাজমান তিনি বেগম রোকেয়া। তার আদর্শকে অম্লান করে রাখার মানসে জাতীয় পর্যায়ে বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন ও রোকেয়া পদক বিতরণ আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়।

তার জীবনাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নতুন প্রজন্ম নব প্রত্যয়ে সমাজে উন্নতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস। গণতান্ত্রিক সরকার নারী মুক্তির দিশারী বেগম রোকেয়ার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন।

আমি বেগম রোকেয়া দিবস '৯৭ উদ্‌যাপন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন
প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

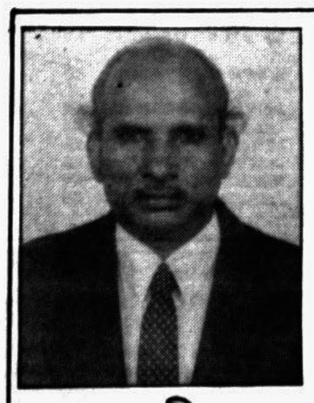

বাণী

আজ রোকেয়া দিবস। উপমহাদেশের নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। আজ সেই ৯ ডিসেম্বর - আর এ দিনটি পালিত হচ্ছে 'রোকেয়া দিবস' হিসাবে। প্রতিবৎসরের ন্যায় এ বারও জাতীয় পর্যায়ে এ দিবসটি পালিত হচ্ছে।

সামাজিক প্রতিকূলতা ও ধর্মীয় বিধি নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ মুসলিম নারী জাতিকে আলোর পথ দেখিয়েছেন বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়া আজ বেঁচে নেই তবুও তিনি বেঁচে আছেন এ দেশের প্রতিটি নারীর অন্তরে। রোকেয়ার আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়ে এ দেশের নারী সমাজ আজ দেশের উন্নয়নের স্রোত ধারায় এগিয়ে চলছে। এক কথায় এ দেশের নারী সমাজ বেগম রোকেয়ার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকল।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠির অর্ধেক নারী। এ বিপুল সংখ্যক মহিলাকে অন্ধকারে রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের উন্নয়ন করতে হলে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে এ সত্যটিকে উপলব্ধি করে বেগম রোকেয়া বলেছিলেন- "কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও। নিজের অন্ন বস্ত্র উপার্জন করুক"।

জীবনের প্রতি তার মূল্যবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। তৎকালীন যুগ ও সামাজিক কাঠামোর বিধি নিষেধ তাকে রুদ্ধ করে রাখতে পারেনি। মহিলা উন্নয়নের জন্য বীজবপন করে গিয়েছেন আজকের আলোচিত মহান ব্যক্তিত্ব বেগম রোকেয়া। তার কর্ম, তার আদর্শ, তার চিন্তা-চেতনা অনুসরনের মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বের নারী মুক্তি সম্ভব বলে আমি মনে করি। তাই আজকের এ দিনে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে নারী শিক্ষা ও নারী উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়ে দেশ ও জাতিকে মুক্তির পথে অগ্রসর করার জন্য সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

আমিন

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ আশরাফ আলী
মহা-পরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দাও। নিজের অন্ন বস্ত্র উপার্জন করুক"
-বেগম রোকেয়া

সৌজন্যেঃ-

অগ্রণী ব্যাংক
জনতা ব্যাংক
সোনালী ব্যাংক